মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায়
বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ কেবল স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়, বরং ছিল মুক্তির যুদ্ধ

এমিরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

(ভাষণের নির্বাচিত অংশ)

আজকের এই অনুষ্ঠানে, যাকে আমরা স্মরণ করছি- বজলুর রহমান, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার নিজের একসময় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি সম্পাদকীয়র সাথে যুক্ত থাকব। কিন্তু আমাদের সময়ে সাংবাদিকতা মানুষকে জীবিকার নিশ্চয়তা দিত না। সেজন্যই আমার সাংবাদিকতায় না গিয়ে শিক্ষকতা পেশায় যাওয়া। কিন্তু আমি পত্রিকার সঙ্গে সবসময়ই জড়িত ছিলাম। বজলুর রহমান যে পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন,

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২৪ প্রদান

‘আমরা আশা করব যে, এই পুরস্কার তাদেরকে আরো ভালো কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। কেবল আশা নয় এটা আমাদের ভরসাও বটে, তাদের কাজ অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অতিক্রম করবেন এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবেন’- গত ৩০ আগষ্ট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এমিরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানিয়ে একথা বলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, এই পদক একঝাঁক নিষ্ঠাবান সাংবাদিক সৃষ্টি করেছে, যারা মুক্তিযুদ্ধ চর্চা করে। অতীতকে সক্রিয় করা এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটি গত অর্ধশত বছরের বেশি সময় ধরে পালন করে আসছে এ দেশের সাংবাদিকরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে তিনি তাদেরকে অভিবাদন জানান। তিনি মনে করেন যে সাংবাদিকদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এটি সম্ভব হত না। প্রতি বছর, অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রতিবেদন থাকে, প্রাইম টাইমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এপিসোড প্রচারিত হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা যেহেতু আজও বাংলাদেশে আছে, সেই বিবেচনা থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময়ে সক্রিয় থাকবে। ভবিষ্যতে এই পদকের সাথে গবেষণার প্রয়াসকে যুক্ত করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব দেশেই ইতিহাস নির্মান করেন যারা ক্ষমতাধর তারা, কাজেই ইতিহাসের কোন

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজে মাসিক বক্তৃতা-১৭

মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী মৃত্যুসংখ্যা: একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক অনুসন্ধান

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজিত মাসিক বক্তৃতা সিরিজের সতেরোতম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে। বক্তৃতা প্রদান করেন নাজমুল ইসলাম, সিনিয়র স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার, কোয়ালকম এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন হতাহতের নিবেদিত গবেষক।

তিনি তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর জীবন-সংকট এবং মৃত্যু সংখ্যা। উপাত্তভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখান, প্রায় ৬.৫ লাখ শরণার্থী ভারতে মৃত্যুবরণ করেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ সংখ্যা হতো মাত্র ৮৬ হাজার, অর্থাৎ অতিরিক্ত ৫.৬ লাখ মৃত্যু ঘটে অনাহার, অপুষ্টি ও মহামারির কারণে।

গবেষণায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা এর থেকেও বেশি হতে পারে, কারণ- পথে মারা যাওয়া বহু শরণার্থীর মৃত্যু রেকর্ড হয়নি, সরকারি প্রতিবেদনে প্রায়শই মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে, বড় ক্যাম্প যেমন সল্টলেক

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্দশতম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন : ২২ আগস্ট ২০২৫

২২ আগস্ট ২০২৫ প্রতি বছরের ন্যায় সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক 'জেনোসাইড এবং জাস্টিস' বিষয়ক মাসব্যাপী ১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হলো। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী। তিনি শিক্ষার্থীদের কোর্সে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ, জেনোসাইড এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা, কার্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করেন। সার্টিফিকেট কোর্সে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ৪২ জন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী অংশগহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এই কোর্সের বিশেষ দিক হলো এর বৈচিত্র্য। আইন, অপরাধবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থী এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। কোর্সে ২২ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫টির বেশি লেকচারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জেনোসাইড এবং জাস্টিসকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা লেকচার প্রদান করবেন। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১২টি লেকচার সম্পন্ন হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন' বিষয়ে ড. উপল আদিত্য ঐক্য (সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়), '১৯৪৭ দেশভাগ থেকে ১৯৭১ জেনোসাইড: ইতিহাস থেকে শিক্ষা' বিষয়ে মফিদুল হক (পরিচালক, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এবং ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর), 'সংঘাত পরবর্তী সমাজে যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য ন্যাবিচার: আরও বিস্তৃত স্বীকৃতি, পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিপূরণের মাত্রা' বিষয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন (এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সম্মানসূচক পরিচালক, ব্ল্যাস্ট), 'আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন: নুরেমবার্গ, টোকিও ট্রাইব্যুনাল থেকে আইসিসি' বিষয়ে ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম (প্রফেসর, আইন বিভাগ এবং ডিন, স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশাল সাইন্স, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়), 'Bangladesh 1971: The Rape of a People' বিষয়ে আফসান চৌধুরী (স্বাধীন গবেষক এবং অতিথি প্রভাষক, ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ এবং হিউম্যানিটিস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়), 'রোহিঙ্গা গণহত্যার আলোকে অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচারের ধারণা: শিবিরগুলোর প্রতিফলন' বিষয়ে নাসরিন আক্তার (প্রোগ্রাম অফিসার, এশিয়া জাস্টিস এবং রাইটস-আজার), 'শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি সুরক্ষা কাঠামো এবং ইউএনএইচসিআর' বিষয়ে সালেহ মোহাম্মাদ শাফি (সহকারী প্রোটেকশন অফিসার,

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লিবারেশন ডক কমিউনিটির তৃতীয় আয়োজন

২৮ আগস্ট ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে লিবারেশন ডক কমিউনিটির মাসিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, গবেষণার ধরন উপস্থাপনা এবং নির্মাণাধীন কাজের পর্যালোচনা ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক ফরিদ আহমদ চলচ্চিত্র বিষয়ক পর্যালোচনার পরে নাতালি কিউবাইডস ব্রাডির নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র The Veiled City (২০২৩) প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। যুক্তরাজ্যে নির্মিত ১৩ মিনিটের এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি শিল্পবিপ্লব পরবর্তী লন্ডন শহরের পরিবেশের সংকট নিয়ে নির্মিত। অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্রটির বিভিন্ন শৈল্পিক দিক, চিত্রগ্রহণ, নির্মাণ ও বর্ণনার ধরণ নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের ডায়াস্পোরা চলচ্চিত্রে আন্তঃসাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প নিয়ে একটি উপস্থাপনা করেন জোবায়ের রায়হান। তিনি ডায়াস্পোরা চলচ্চিত্রগুলোর স্বল্পদৈর্ঘ্য পর্যায়ে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সাথে বিভিন্ন ডায়াস্পোরা পরিচালক কীভাবে তাদের চলচ্চিত্রে ডায়াস্পোরা বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং তিনি নিজে তার কাজটিতে কোন পদ্ধতিতে এই বিষয়কে উপস্থাপন করবেন তা নিয়ে সকলের সাথে মতবিনিময় এবং পরিকল্পনা আদান-প্রদান করেন।

তৃতীয় পর্বে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন'-কে ভিত্তি করে চলচ্চিত্রের আইডিয়া উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হয়। অংশগ্রহণকারী নাফিয়া আফরিন 'অন্দর-বাহির: অবরোধ থেকে অদম্যে' শিরোনামে তার ফিকশনাল মিনি সিরিজের ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে সুলতানা ভগিনী সারাকে নিয়ে উপমহাদেশের অবরোধ প্রথার বিভিন্ন আঙ্গিক পর্যালোচনা করবে। নাফিয়ার উপস্থাপনের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, লিবারেশন ডক কমিউনিটির মধ্য থেকে সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে চলচ্চিত্র বা গবেষণার আরও প্রস্তাবনা পাওয়া যাবে।

চতুর্থ পর্বে নির্মাতা অনুশ্রী রায় তার চলচ্চিত্র 'ভাঙন'-এর একটি প্রদর্শনী করেন। প্রায় ১০ মিনিটের এই চলচ্চিত্রে তিনি চলচ্চিত্রের নামকে কীভাবে রূপক অর্থে ব্যবহার করছেন, বিভিন্ন দৃশ্য ধারণের পদ্ধতি এবং তথ্য সংযোজন-বিয়োজন নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরেন ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগস্ট মাসের লিবারেশন ডক কমিউনিটির মুক্ত আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে, এই মাসিক আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র, গবেষণা পদ্ধতি এবং 'সুলতানার স্বপ্ন'- কে কেন্দ্র করে সমাজ এবং নারী অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করা।

কেয়া চক্রবর্তী
স্বেচ্ছাকর্মী, লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

এনিগমা টিভি নির্মিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ভিত্তিক ডকু রিপোর্টের উদ্বোধনী প্রদর্শনী

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৪টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে এনিগমা টিভি নিবেদিত ও নিহার সুলতানা পরিচালিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ডকু-রিপোর্টের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসেফিক আঞ্চলিক কমিটি দ্বারা বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থটি নিয়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর অন্যতম ছিল ‘সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উদযাপন’ উৎসব। বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির ২৭টি পাঠাগার নিয়ে আয়োজিত এই উৎসবের নানা দিক, সুলতানার স্বপ্ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশে প্রথম পাঁচজন নারীর শীতকালীন হিমালয়ের তিনটি চূড়া জয়ের কাহিনী তুলে ধরে নির্মিত হয়েছে ১৮ মিনিটের ডকু-রিপোর্ট সুলতানার স্বপ্ন।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এনিগমা টিভি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদুল ইসলাম শান্তনু ও পরিচালক নিহার সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি’র সভাপতি মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, সদস্য-সচিব মো: জহির উদ্দিনসহ সংহতির সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী নিশাত মজুমদারসহ ‘অভিযাত্রী’র অনেক সদস্য।

প্রদর্শনীর শুরুতে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আবেদনে ইউনেস্কো রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করায় আমাদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে; দায়িত্ব বেড়ে গেছে। এটা এখন শুধু আমাদের নয় আন্তর্জাতিক সম্পদ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সুলতানার স্বপ্নকে বিকশিত করতে হবে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বহুমাত্রিক চেতনা জাগ্রত করার ও বিকশিত হবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তাই, সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করা খুবই প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে সুলতানার স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি। তাই বেশি বেশি বই পড়া প্রয়োজন। ‘অভিযাত্রী’ এর সাথে যুক্ত হয়ে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তাই আমাদের বাংলাদেশী নারীরা প্রমথ ‘উইমেন্স উইন্টার এক্সপেডিশন’ দেশব্যাপী চমক সৃষ্টি করেছে। অনেক মেয়ে এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে, তারাও এখন সুলতানা হতে চায়।

গ্রন্থাগার সংহতি’র সভাপতি মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ বলেন, আমরা যার যার স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে বেসরকারি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তা পরিচালনা করছি। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের একত্র করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। একাজে আমরা বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সহায়তা করছি। সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসবের মাধ্যমে পাঠক এখন তার পাঠ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের বহুমাত্রিক পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে। তাই আমরা দেখলাম প্রবন্ধ-কবিতা, দেয়ালিকা, আলোচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন, নাচ-গান, লাঠিখেলা, পাহাড়ে অভিযানসহ বিভিন্নভাবে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। পাঠকদের পাশাপাশি গ্রন্থগার পরিচালনায় যারা সম্পৃক্ত তাদের মধ্যেও স্বপ্নের পাহাড় তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করি গ্রন্থপাঠের এ উদ্যোগ অব্যহত থাকবে।

এনিগমা টিভি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদুল ইসলাম শান্তনু বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন কর্মী। জাদুঘরের সাথে কাজ করতে পারলে ভালো লাগে। লাইব্রেরিকে যুক্ত করে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ভালো কিছু কার্যক্রম হবে আশা করা যায়। সবাই মিলে ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। একটা ওটিটি প্লাটফরম তৈরি করছি দেশ-বিদেশ থেকে যা দেখা যাবে। এ স্বপ্ন আমি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে চাই।

ডকুমেন্টারি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান অথ বা লিংকে ক্লিক করুন

https://www.youtube.com/watch?v=j_2bqrYUekI

এস এম মোহসীন হোসেন
সাম্মানিক ব্যবস্থাপক, শিক্ষাকর্মসূচি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক প্রাপ্ত সাংবাদিকদ্বয়

সাহাদাত পারভেজ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৪ -এর জন্য প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে দেশ রূপান্তর পত্রিকার আলোকচিত্র সম্পাদক সাহাদাত পারভেজ পুরস্কৃত হয়েছেন।

সাহাদাত পারভেজ-এর ‘একটি আইকনিক ছবির ভ্রান্তি’ শিরোনামে প্রতিবেদনটি ২০২৪ সালের ৪ এপ্রিল দেশ রূপান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ভুল তথ্য ইতিহাসে বিভ্রান্তি তৈরি করে, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন। ইচ্ছাকৃত না হলেও মুক্তিযুদ্ধের কিছু ছবি নিয়ে ভ্রান্তি আছে। তেমনই একটি ছবি যা একাত্তরের বলে বহুল প্রচলিত সেটি একাত্তরের নয় বলে প্রতিবেদক তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য-প্রমাণ সহযোগে তুলে ধরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আশা করছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে তার চেষ্টা আগামী দিনগুলোতেও চলমান থাকবে।

মো. শফিকুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৪-এর জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে একাত্তর টেলিভিশনের-এর হেড অব নিউজ মো. শফিকুল ইসলাম পুরস্কৃত হয়েছেন।

মো. শফিকুল ইসলাম ‘রণাঙ্গনের স্মৃতি’ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিশেষ ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ২০২৪ সালের ১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর একাত্তর টেলিভিশন সম্প্রচার করেছে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহস এবং বীরত্ব নিয়ে লড়াই করে যারা স্বাধীনতা এনেছেন তাদের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য ধারণ এবং প্রচার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পৌঁছে দেবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। প্রতিবেদক রণাঙ্গণের ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধসহ মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র পর্বের নানাদিক তুলে ধরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আশা করছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে তার কর্মতৎপরতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ কর্মশালা

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে নানা রকম প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বিগত কয়েক বছর যাবত এই আয়োজনের অংশী হিসেবে যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট ২০২৫ বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ বিকাশে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজিত হয়। শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চারটি গ্যালারি পরিদর্শন করেন বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকেরা। জাদুঘরের পক্ষে সত্যজিৎ রায় মজুমদার (ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা) আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালাটি শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন যা বেসরকারি গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি বলেন, সদিচ্ছা থাকলে ছোট ছোট কাজ দিয়েও একসময়ে সমাজের বড় পরিবর্তন আনা যায়, সমাজের এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

রিডিং সোসাইটি গঠনে গ্রন্থাগার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রতিনিধি সাংবাদিক ও গবেষক কাজী আলিম-উজ-জামান। তিনি বলেন, বই-গ্রন্থাগার নিয়ে কাজ শুরু করি ২০১৫ সাল থেকে। দেশের তরুণ তরুণীদের মূলধারার বই পড়ানোর দিকে নিয়ে আসতে কাজ শুরু করলাম। সেই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ঢাকার ৪১টি পাঠাগার নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সবগুলো পাঠাগারই পুরান ঢাকায়, নতুন ঢাকা বলতে যেদিকগুলোকে বোঝায় সেদিকে তেমন কোনো পাঠাগার পাইনি। জাতীয় অনেক সীমাবদ্ধতা থাকার পরও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অনেকদিন যাবত সৃজনশীল পাঠক তৈরি করার লক্ষ্যে রিডিং সোসাইটি গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশের নানাপ্রান্তের গ্রন্থাগার সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে যা মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়া বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে রিডিং সোসাইটি গঠনে উৎসাহিত করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ বিকাশে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, বেসরকারি গ্রন্থাগার মানেই সমাজের শক্তি একীভূত হওয়া। মুক্তিযুদ্ধ এবং গ্রন্থাগার একই চেতনায় কাজ করে মানুষের মুক্তির আকুতি, মুক্তির পথের অনুসন্ধান, বাধা মোকাবিলা করাই মুক্তিযুদ্ধ এবং গ্রন্থাগারের কাজ। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো স্ব-উদ্যোগে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের আশায় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এমন কিছু গ্রন্থাগার আছে শতবছরের পুরোনো, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বেশকিছু সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যেমন রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি নারী নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সামাজিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলো আবার নতুন করে কাজ শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বইপড়া কার্যক্রম নিয়ে বলেন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার সৃজনশীল চর্চা ধরে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ এবং সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে বইপড়া কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা কালজয়ী বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০২৪ সালে যা ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল রেজিস্ট্রার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই ধারাবাহিকতায় ঢাকা শহরের গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠকদের সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ নেওয়া হয় যেখানে পাঠকেরা অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। রোকেয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাংলার পাঁচ নারী 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শিরোনামে অংশগ্রহণ করেন নারীদের প্রথম শীতকালীন হিমালয় অভিযানে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেই ১৯০৫ সালে একটা নারীস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা আজও আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক। সমাজ বিকাশে সুলতানার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের নিজ নিজ গ্রন্থাগারে পাঠপ্রতিক্রিয়ার আয়োজন, বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তথ্যটি সঠিক এবং কোনটি বস্তুনিষ্ঠ নয় সেটি বিবেচনার জন্য গবেষণার বিকল্প নেই।

প্রধান অতিথি এমিরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করেন। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি, সম্প্রতি সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের আত্মহত্যাসহ আরো কিছু আত্মহত্যার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন এই আত্মহত্যার পেছনের কারণ হতাশা। এরা প্রত্যেকেই জীবন নিয়ে প্রচণ্ড হতাশ ছিলেন। পিপিআরসি-এর প্রতিবেদনের উল্লেখ করে তিনি বলেন গত দুই বছরে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি হতদরিদ্রের সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে, একই সাথে শতকরা ৮০ জন লোকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের পেছনেই শতকরা ৫৫ভাগ খরচ হয়ে যাচ্ছে। এটিই বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র উল্লেখ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করেন, মুক্তিযুদ্ধের কারণ কী ছিল, কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল? তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল সামাজিক মুক্তি, সমাজের পরিবর্তন এবং সেটি অর্জন করতে গেলে প্রয়োজন সামজিক বিপ্লব। তিনি বলেন আমরা সংবাদপত্র এবং মিডিয়ার স্বাধীনতার কথা বলি কিন্তু আসলে যেটি দরকার সেটি হলো সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সাংবাদিকদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়গুলো তুলে ধরতে উৎসাহ প্রদান করে। তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীর শেষ নেই, মুক্তিযুদ্ধে মানুষের যে যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তা অন্তহীন, তা লেখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রয়োজন।

সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, ২০০৮ সালে বজলুর রহমানের মৃত্যুর পরে তার স্বপ্নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ২০০৯ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য বজলুর রহমান স্মৃতিপদক প্রবর্তন করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন ধারাবাহিকভাবে যারা বিজয়ী হয়েছেন তারা অধিকাংশ তরুণ সাংবাদিক। এই তরুণ সাংবাদিকদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে, তারপরেও তারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন, আন্তরিকভাবে কাজগুলো করার চেষ্টা করছেন এবং নানা ধরণের অনুসন্ধানী রিপোর্ট তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি মনে করেন এইসব প্রতিবেদনগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন, এর জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অ্যালামনাই গঠন করা ও তাদের প্রতিবেদনগুলোর আর্কাইভ তৈরি করা যেতে পারে। আর এভাবেই নতুন প্রজন্ম ৫৪ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধকে বহমান রাখবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রয়াত জুরিবোর্ড সভাপতি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ত্রপা মজুমদার। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৪-এ প্রিন্ট মিডিয়ায় পুরস্কৃত হন দেশ রূপান্তর পত্রিকার আলোকচিত্র সম্পাদক সাহাদাত পারভেজ। তিনি তার একটি 'আইকনিক ছবির ভ্রান্তি' শিরোনামের প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্মৃতিপদক পান একাত্তর টেলিভিশনের হেড অব নিউজ মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি 'রণাঙ্গণের স্মৃতি' শিরোনামে ১৫ পর্বের এপিসোডের জন্য পুরস্কার পান।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের সাপ্তাহিক স্মৃতিচারণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে নিয়মিত কর্মসূচি যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস জানতে পারে। সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাথে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৪ সেপ্টেম্বর মিরপুরস্থ কাজি আবুল হোসেন হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ২৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে স্মৃতিচারণ করেন শহিদ মোফাজ্জল শেখ-এর নাতি আল আমিন এবং শহিদ আব্দুল হাকিম-এর পুত্র আব্দুল হামিদ। স্মৃতিচারণে আল আমিন বলেন, আমার নানা মোফাজ্জল শেখ ছিলেন সেনপাড়া পর্বতার মুদি দোকানদার। ২৫ মার্চ সারা দেশে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি সপরিবারে সেনপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। ২৬ মার্চ আনুমানিক সকাল দশটার দিকে বিহারি আকতার গুন্ডা আমার নানা মোফাজ্জল শেখকে ধরে নিয়ে যায়। আমার নানী আমেনা বেগম আমার মা, খালা এবং মামাদের নিয়ে মিরপুর দশ নম্বরে এক মাজারে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেও বিহারিরা আমার নানী এবং মামাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। সেদিন তারা প্রাণে বেঁচে গেলেও আঘাতের চিহ্ন মৃত্যু পর্যন্ত বহন করেছেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আমার নানী খবর পান তার স্বামী মোফাজ্জল শেখকে হত্যা করে এই জল্লাদখানায় লাশ ফেলে গেছে। এখান থেকে নানার লাশ নিয়ে তারা সেনপাড়া পর্বতায় বাড়ির পাশে কবর দেন। পরদিন তারা মিরপুর এলাকা ছেড়ে আমিন বাজার গিয়ে আশ্রয় নেন। ১৫ দিন সেখানে থাকার পর তারা চলে যান গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরের কনকসার গ্রামে।

সেখানে তারা পাঁচ-ছয় মাস থাকার পর জীবিকার সন্ধানে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের পুরো সময়টা তারা এভাবেই কাটান। দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয় মাস পর তারা মিরপুরে ফিরে আসেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা যাওয়ায় আমার নানী তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে তার সন্তানদের বড় করেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছিলেন। এছাড়া আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাননি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে নানার কবরটি আমরা পরে রক্ষা করতে পারিনি। সিটি করপোরেশন রাস্তা সম্প্রসারণের সময় কবরটি ভেঙ্গে ফেলে। এই জল্লাদখানায় আসলে নানার নামটি দেখলে একটু ভালো লাগে। নানার কবর রক্ষা করতে আমরা পারিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই স্মৃতিটুকু সংরক্ষণ করেছেন এজন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই। কর্মসূচি শেষে আব্দুল কাদের নামে এক শিক্ষার্থী মন্তব্য লেখে, 'আজকে এই বধ্যভূমিতে এসে আমরা জানলাম যুদ্ধের সময়কার ভয়াবহ কর্মকান্ড। একটি কথা আমরা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে ১৯৭১-এর ইতিহাস কখনো মুছে যাবে না। যা চিরন্তন সত্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে এই বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। আজ যুদ্ধের ভয়াবহতা জানতে পারলাম নতুন করে। যুদ্ধের এই ইতিহাস আমরা কখনো মুছে যেতে দিবো না। সঠিক তথ্য সবসময় জানবো। আর মুক্তিযুদ্ধের সাথে কোন কিছুর তুলনা করবো না। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মুক্তি এবং স্বাধীনতার পথ তৈরি করে দিয়েছে। তাই আমরা মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণ রেখে বাংলাদেশকে সুন্দর করতে অবদান রাখবো।'

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থীদের মন্তব্য

বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্বাধীন করতে আমাদের অগ্রজদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। উনাদের জন্যই আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রজন্মগুলোকে জানানো, মুক্তিযুদ্ধের সাম্যের চেতনায় দেশকে গড়তে সব সময় আমার চেষ্টা থাকবে ইনশা আল্লাহ।

কৃষিবিদ মো: এনামুল হক রাজিব
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

বাংলার সৃষ্টি, সভ্যতা ও আদি ইতিহাসসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে অনেক নিদর্শন দিয়ে সমৃদ্ধ এই জাদুঘর। যে কোনো বিপদগামী দেশদ্রোহীকে এখানে একবার পরিদর্শন করালে তার মধ্যে দেশপ্রেম উদয় হলেও হতে পারে।
তবে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আরো নিদর্শন খোঁজ করা উচিত এবং এই জাদুঘরকে আরো সমৃদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনে বিভিন্ন যুদ্ধ ঘটনার অ্যানিমেশন শো করা যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন সুমিত চৌধুরী, চট্টগ্রাম

আমি একজন বাংলাদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে অত্যন্ত আনন্দ ও খুশি হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই জাতীয় সংগীত মনে হয়ে গেল। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরও উন্নতি সাধন করুক এই প্রত্যাশায়।

প্রশান্ত কুমার
লালনশাহ গণগ্রন্থাগার

আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের শেকড়ের গল্পকে বহন করার জন্য এবং আমাদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টার জন্য। এই জার্নি চলুক।

ইফফাত আরা নাসরিন মুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এমন কিছু জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, নির্যাতন, সংগ্রাম ও বীরত্বের জয়গাথা সম্পর্কে জানান দেয়।

গোলাম কিবরিয়া

আজ ১৩ আগস্ট ২০২৫। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে এসে সত্যিই অভিভূত। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সরকারি গণগ্রন্থাগার, গ্রন্থ ভবনকে। যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

মো: হানিফ
সভাপতি, সোনালী সুদিন পাঠাগার, চাঁদপুর

মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী মৃত্যুসংখ্যা: একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক অনুসন্ধান

১-এর পৃষ্ঠার পর

তুলনামূলক ভালো সাহায্য পাওয়ায় তথ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, এবং সহিংস হত্যাযজ্ঞ যেমন চুকনগর গণহত্যা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নয়। বক্তৃতায় আরও তুলে ধরা হয় যে প্রচলিত ১৯৭১ সালের মৃত্যুর হিসাব সাধারণত শুধু সহিংস হত্যাকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে। শরণার্থীদের ক্ষুধা ও রোগে মৃত্যু যুদ্ধেরই সরাসরি পরিণতি। তাই যে কোনো পূর্ণাঙ্গ মৃত্যুর হিসাবের মধ্যে এসব অসহিংস মৃত্যু অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
নাজমুল ইসলাম এ গবেষণার মাধ্যমে সমকালীন শরণার্থী সংকট- যেমন গাজা, দক্ষিণ সুদান বা রোহিঙ্গা পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৭১ সালের সাদৃশ্যের দিকটিও উল্লেখ করেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, তথ্যনির্ভর গবেষণা বাংলাদেশের গণহত্যাকে বৈশ্বিক মঞ্চে যথাযথ ভাবে স্বীকৃতি দিতে সহায়ক হবে।
বক্তৃতার উপসংহারে তিনি মনে করিয়ে দেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে হলে ১৯৭১ সালের সকল ভোগান্তি-সহিংসতা, অনাহার, রোগব্যাধি ও সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন- সম্মিলিতভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
রিসার্চ এসিস্টেন্ট, সিএসজিজে

যুদ্ধে কেবল সহিংস নয়, অহিংস মৃত্যুর সংখ্যাও অসংখ্য

গবেষক নাজমুল হাসান

আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিলো যে, ভারতের মধ্যে শরণার্থী শিবিরগুলোর কত শরণার্থী মারা গিয়েছিলেন। তথ্য পাওয়া আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টকর ছিলো, বিশেষত এক একটি ক্যাম্পের তথ্য খুঁজে বের করতে। ১৭টি ক্যাম্পের তথ্য আসে বিভিন্ন সোর্স থেকে, তার মধ্যে ২টি সোর্স আসে সার্ভে থেকে। সেই সময়ে ২টি ক্যাম্পে ২জন বিদেশি গবেষক বসে প্রতিদিন গুণছিলেন যে কতজন আসছে এবং কতজন মারা যাচ্ছে। তাদের কাজ ১৯৭১ সালে কোনো একটি জার্নালে প্রকাশ পায়। লেখাটি আমি ২০১৩ বা ২০১৪ সালে দেখি এবং এটা দেখেই আমার প্রথম মনে হয় যে শরণার্থী শিবিরের মৃত্যুহার বের করা সম্ভব। ১৭টি ক্যাম্পের তথ্য দিয়ে আমরা পুরো ভারতের শরণার্থীর মৃত্যুসংখ্যা প্রজেক্ট করি। আমাদের প্রাথমিক ফাইন্ডিংস: ১ কোটি শরণার্থীর মধ্যে অন্তত সাড়ে ৬ লাখ ভারতে মারা গেছে। এই শরণার্থীরা যদি ভারতে না যেতেন এবং যদি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত এবং যদি তারা বাংলাদেশেই থাকতেন তাহলে আনুমানিক ৮৬ হাজার মানুষ মারা যেত ১ কোটির মধ্যে। শান্তিকালীন সময়ে হয়ত ৮৬ হাজার মানুষ মারা যেতেন কিন্তু শরণার্থী শিবিরের তথ্য থেকে আমরা পাচ্ছি যে অন্তত ৫ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ অতিরিক্ত মারা গেছেন। আমাদের গবেষণার প্রধান লিমিটেশন হচ্ছে তথ্যের স্বল্পতা। ১৭ টি ক্যাম্পের মধ্য থেকে কিছু কিছু ক্যাম্পের ডেটা আমরা হয়ত শুধু মাত্র ২ মাস, ৩ মাস অথবা কয়েক সপ্তাহের জন্য পেয়েছি। এই লিমিটেশনের কারণে আমাদের ৫ লাখ ৬০ হাজার যে অতিরিক্ত মৃত্যুহার সেটা আন্ডারকাউন্ট। এর বিভিন্ন কারণ আছে। একটি হচ্ছে, অনেক ক্যাম্পে আমরা অফিসিয়াল ডেথ রেট ব্যবহার করি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আনঅফিসিয়াল ডেথ রেট অফিসিয়াল ডেথ রেটের থেকে বেশি। আমাদের কাজে ক্যাম্পে গিয়ে যারা থেকেছে তাদের মধ্য হতে কতজন মারা গেছে সেটা আমরা বের করেছি কিন্তু অনেকে শরণার্থী হয়ে যাওয়ার পথেও মারা গেছেন, অনেকে রোগে মারা গেছেন, ক্ষুধায় মারা গেছেন। এই মৃত্যুগুলোর সংখ্যা আমাদের কাছে ছিলোনা। সেগুলো ধরলেও হয়ত মৃত্যুসংখ্যা আরেকটু বেশি আসত কিন্তু সেগুলো আমাদের অ্যানালাইসিসে আসেনি। দেশের মাটিতে মারা যাওয়া মানুষগুলো আমাদের গবষেণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমাদের ফাইন্ডিংটি আন্ডারকাউন্ট হওয়ার এটাও কিছুটা কারণ। কিন্তু এখানে একটি বিষয় আমাদের গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১৯৭১ সালের মৃত্যুসংখ্যা নিয়ে একটি কমন প্রশ্ন করা হত যে, ৯ মাসে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি ৩০ লাখ লোক কীভাবে খুন করল। যুদ্ধে শুধু ভায়োলেন্ট ডেথ হয়না বরং প্রচুর নন ভায়োলেন্ট ডেথও হয়। এবং যেকোনো অ্যানালাইসিসে ভায়োলেন্ট ডেথ এর পাশাপাশি নন ভায়োলেন্ট ডেথও কাউন্ট করা

৭১ সালের মোট মৃত্যুসংখ্যাকে ভাগ করতে চাইলে ভায়োলেন্ট এবং নন ভায়োলেন্ট ডেথ হিসেবে ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। নন ভায়োলেন্ট ডেথকে আমরা আবার ২ ভাগে ভাগ করতে পারি যেখানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী শরণার্থীরা ভারতে কতজন মারা গেছে এবং আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশের ভেতর কতজন মারা গেছে। বাংলাদেশের মৃত্যুসংখ্যা নিয়ে অনকে তর্ক বিতর্ক আছে। কোথাও ৩ লাখ, কোথাও ৩০ লাখ আবার কোনো কোনো বইতে ১ লাখের কথাও বলা হয়ে থাকে। আমাদের কাজের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে শুধুমাত্র শরণার্থী শিবিরেই যদি ৫ লাখ ৬০ হাজার অতিরিক্ত মৃত্যুসংখ্যা হয় তবে মোট মৃত্যুসংখ্যা তো অবশ্যই বেশি হবে। অন্তত, লো কাউন্ট সংখ্যাগুলো শুধু শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা দেখিয়েই উড়িয়ে দেয়া যায়। মনে রাখা জরুরি যে, বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রিফিউজি ক্রাইসিসে আমাদের দেশের মানুষই শিকার হয়েছিলেন।

উচিত নাহলে সেই অ্যানালাইসিস কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয়না। নন ভায়োলেন্ট ডেথকে আমরা আবার ২ ভাগে ভাগ করতে পারি যেখানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী শরণার্থীরা ভারতে কতজন মারা গেছে এবং আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশের ভেতর কতজন মারা গেছে। আমাদের কাজ শুধু এইটুকুর মধ্যেই। বাংলাদেশের মৃত্যুসংখ্যা নিয়ে অনকে তর্ক বিতর্ক আছে। কোথাও ৩ লাখ, কোথাও ৩০ লাখ আবার কোনো কোনো বইতে ১ লাখের কথাও বলা হয়ে থাকে। আমাদের কাজের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে শুধু শরণার্থী শিবিরেই যদি ৫ লাখ ৬০ হাজার অতিরিক্ত মৃত্যুসংখ্যা হয় তবে মোট মৃত্যুসংখ্যা তো অবশ্যই বেশি হবে। অন্তত, লো কাউন্ট সংখ্যাগুলো শুধু শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা দেখিয়েই উড়িয়ে দেয়া যায়।

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে আমার অভিমত অনুযায়ী, বাংলাদেশের গণহত্যাটি এখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। পলিটিক্যাল সাইনটিস্ট ডোনাল্ড বিচলার খুব সুন্দর করে বলেছেন 'জেনোসাইড স্কলাররা একটা গণহত্যার উপর তখনই ফোকাস করে যখন সেটা পলিটিক্যালি এবং ইনটেলেকচুয়ালি এডভান্টেজিয়াস হয়'। আমেরিকা বা পশ্চিমের মেইনস্ট্রিম জেনোসাইড স্কলাররা সাধারণত একটা গণহত্যার উপর ফোকাস করেন যখন গণহত্যাটা তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের কেউ করেন। যেমন কম্বোডিয়ান জেনোসাইডের কথা অনেক আসে কারণ খেমারুজেরা কমিউনিস্ট ছিল আমেরিকার বিরুদ্ধ পক্ষে, সুতরাং এটা আমেরিকার জন্য খুবই সহজ, খুবই কনভিনিয়েন্ট পশ্চিমাদের জন্যও। দূর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমের লেফট উইংস স্কলাররাও বাংলাদেশের গণহত্যার উপর সেভাবে ফোকাস করেননি কারণ বাংলাদেশ আলটিমেটলি লেফট উইং ব্লকে যায়নি, সে কারণে তাদের কাছ থেকেও এটা মিস হয়ে গেছে। দুদিক থেকেই অনেকটা অনুপস্থিত থেকেছে পশ্চিমের চোখ থেকে। একারণে বাংলাদেশের মানুষকেই জেনোসাইড নিয়ে কাজ করতে হবে, আমাদের উপর ঘটে যাওয়া গণহত্যার উপর ফোকাস করতে হবে।

এটাও আমি অনেক বাংলাদেশিদের কাছ থেকে দূর্ভাগ্যজনকভাবে শুনি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া গণহত্যা, অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন লাভ কী আমার তো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা কখনোই সামনে এগিয়ে যেতে পারবো না আমরা যদি আমাদের অতীতের সাথে রিকনসিলিয়েশন না করি। আমাদের ৭১ সালে বা আগে-পরে ঘটে যাওয়া সকল এট্রোসিটি কোয়ালিটিটিভলি এবং কোয়ানটিটিভলি ফোকাস করতে হবে। একজন গাণিতিক গবেষক হিসেবে বলতে পারি ৭১ সালের পর ঘটে যাওয়া বিহারিদের যে মারা হয়েছে সেটার উপরও ফোকাস করতে হবে। কোনোকিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। যেমন ধরুন আমাদের কাজে দেখা যাচ্ছে অন্তত ৫ লক্ষ ৬০হাজার অতিরিক্ত মানুষ মারা গেছে ভারতের শরণার্থী শিবিরে। আমরা আনঅফিশিয়াল রিপোর্ট থেকে জানি ৭০ থেকে ৮০ পার্সেন্ট শরণার্থী হিন্দু ছিলেন ঐ সময়ে। তার মানে এই ৫ থেকে ৬ লাখ অতিরিক্ত মারা যাওয়া বেশিরভাগ মানুষই আসলে হিন্দু ছিলেন। তারপরও আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন মাইনরিটি গ্রুপস তাদের ধর্মের জন্য বা তাদের জাতীয়তার জন্য পারসিকিউটেট হন। আমরা কখনোই ক্লেইম করতে পারবো না আমরা ৭১ সালের চেতনা পুরোপুরি ধারণ করি যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাইনরিটি গ্রুপ তাদের ধর্মের জন্য, তাদের জাতীয়তার জন্য পারসিকিউটেট হবে না। অতীত আমাদের ঠেকিয়ে রাখবে না, আমরা যদি অতীতের উপর ঠিকভাবে ফোকাস করি অতীত আমাদের ঠিকভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। (সংক্ষিপ্ত)

চতুর্দশতম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন : ২২ আগস্ট ২০২৫

২-এর পৃষ্ঠার পর

ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ), 'ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা' বিষয়ে ড. এস.এম. শামিম রেজা (প্রফেসর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), '১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যা: একজন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গি' বিষয়ে ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা (নির্বাহী পরিচালক, গবেষণা উদ্যোগ বাংলাদেশ), 'স্মৃতি, ট্রমা এবং ন্যায়বিচারে ভুক্তভোগীদের ভূমিকা' বিষয়ে আসিফ মুনির (অধিকার ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীর পুত্র) ইত্যাদি লেকচার সম্পন্ন হয়েছে। এই সকল লেকচারের পাশিপাশি শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন, বিভিন্ন চলচ্চিত্র চিত্রায়ণসহ মিরপুরে অবস্থিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করানো হয়। যা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং বিভিন্ন বধ্যভূমি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন এবং জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনের মাধ্যমে সঠিক অনুধাবনে সক্ষম হন। লেকচারের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপ ওয়ার্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জেনোসাইড সম্পর্কে গবেষণার ধারনা অর্জিত হচ্ছে। ১৯ সেপ্টেম্বর সনদ প্রদানের মাধ্যমে ১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্ত হবে।

আরাফাত রহমান
স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ কেবল স্বাধীনতার যুদ্ধ নয় বরং ছিল মুক্তির যুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেই পত্রিকাতে আমি কলাম লিখতাম। মিতভাষী/মৃদুভাষী/নাগরিক এবং শেষে গাছ-পাথর ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয়তে প্রতি সপ্তাহে কলাম লিখতাম। আমি একটানা ১৪ বছর গাছ-পাথর ছদ্মনামে 'সময় বহিয়া যায়' এই শিরোনামে কলাম লিখেছি। সেই সময়টা আমার জন্য একটি ক্রান্তিকাল মনে হত। কারণ তখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে নানারকম টানাপোড়েন চলছে। তারপর তো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনই ঘটলো।

বজলুর রহমানের উৎসাহ না থাকলে আমি কখনো লিখতেই পারতাম না। সেই জন্য যখন তাকে স্মরণ করি, তখন তার প্রতি আমার ব্যাক্তিগত কৃতজ্ঞতা ও ঋণ সেটার কথা স্মরণ করি। তখনকার দিনে পত্রিকার ধারা ছিলো দুটো। মূলধারা ছিলো জাতীয়তাবাদী এবং তার পাশাপাশি একটি সমাজতান্ত্রিক ধারা ছিলো, সংবাদ তারই মুখপাত্র ছিলো। শহীদ সাবের, সেই অসামান্য লেখক, যিনি কৈশরেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংযোগের কারণে কারাবন্দী হয়েছিলেন । তিনি ৭১ সালের গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে আশ্রয় খুঁজছিলেন এবং আশ্রয় নিয়েছিলেনও সংবাদপত্রের অফিসে। সংবাদপত্রের অফিসে তারও কয়েকদিন পরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে শহীদ সাবের মৃত্যুবরণ করেন। সাংবাদিকতা কখনোই নিরাপদ নয়। এখানে আসার সময় আমার বারবার মনে পড়ছিলো যে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট আমাদেরই এক বন্ধু বিভুরঞ্জণ সরকারের কথা- গত ২১ আগস্ট যিনি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর আত্মহত্যার কারণটি তিনি অবশ্য খোলা চিঠিতে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে সাংবাদিকতার জন্য সবচেয়ে বড় গুণ হলো সাহস। আমরা জানি যে সাংবাদিকদের এই সাহসটি না থাকলে সাংবাদিকতা করা যায় না। সংবাদপত্রে এবং অন্যক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। সবসময় পক্ষপাতিত্ব থাকবেই। কিন্তু সেটি কার দিকে হবে, সেটিই হলো আসল প্রশ্ন। এই যে আমাদের বন্ধু আত্মহনন করলেন, তিনি ছিলেন জনগণের স্বার্থের পক্ষে। সেজন্য তিনি কোনো পুরস্কার বা প্লট পাননি। তাঁর এই মর্মান্তিক কাহিনী স্মরণ করলে এদেশের সাংবাদিকদের জীবন কত কষ্টের তা আমরা বুঝতে পারি। বিভুরঞ্জনের এই আত্মহননের ঘটনা সামাজিক এবং সাংবাদিকতার বাস্তব চিত্রকে উন্মোচিত করে। কয়েকদিন আগে আমরা পত্রিকাতে পড়েছি যে কেমন করে রাজশাহীর পবা উপজেলার একজন দিনমজুর তার স্ত্রী, পুত্রকে হত্যা করে দুটো চিরকুট লিখলেন। একটি চিরকুটে লিখলেন যে, আমি আমার স্ত্রীকে, পুত্রকে এবং দুবছর বয়সী কন্যাকে অভাবগ্রস্থ এবং ঋণগ্রস্থ হয়ে হত্যা করলাম। একই সাথে এও লিখলেন যে আমার বাবাকে যাতে অপমানিত না হোতে হয় সেজন্যই আমি আত্মহননের পথ বেছে নিলাম। আরেক চিরকুটে তিনি লিখেছেন যে, আমার এই চিরকুটটি লেখার কারণ হলো আমার মৃত্যুর পর বাংলার পুলিশ এসে নিরপরাধ মানুষদেরকে নাজেহাল করবে সেজন্য আমিই যে হত্যাকারী সেটি উল্লেখ করে গেলাম। এর কিছু দিন পর আরো একটি ছোট্ট খবর এসেছে, ঠিক একই কারণে কুমিল্লাতে মা এবং মেয়ে আত্মহনন করেছে। বিভিন্ন জরিপ থেকে এসব বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। পিপিআরসি- এর একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, গত দুই বছরে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি হতদরিদ্রের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। একই সাথে শতকরা ৮০ জন লোকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের পেছনেই শতকরা ৫৫ ভাগ খরচ হয়ে যাচ্ছে। এটি হলো এখনকার বাংলাদেশের ছবি, যে ছবি উন্মোচিত হলেই মুক্তিযুদ্ধের কথা ওঠে। কেন আমরা যুদ্ধে গেছি, কেন আমরা এই জাদুঘরে তার স্মৃতিকথা রক্ষা করছি, সে স্মৃতিগুলো কতটা ভয়ঙ্কর তা আমরা জানি। এই যুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধ কেবল স্বাধীনতার যুদ্ধ নয় বরং এই যুদ্ধ ছিলো মুক্তির যুদ্ধ। ৪৭ সালে স্বাধীনতার নামের যে দেশভাগ হয়েছিলো, সেটি যে কত মর্মান্তিক ছিলো তা আমরা মর্মে মর্মে, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। পাকিস্তানি শাসকরা যেখানে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিলো তার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করলাম। আমরা আশা করলাম যে মুক্তি আসবে। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বারবার বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনেক কথা আপনি বলতে পারবেন, অনেক সংজ্ঞা দিতে পারবেন, অনেক দীর্ঘ করতে পারবেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে যদি স্থুলভাবে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিলো সামাজিক বিপ্লবের চেতনা। আমরা পুরোনো সমাজ চাইনি। আমরা কেবল পাকিস্তানকে ভেঙে ছোট একটি রাষ্ট্র তৈরী করতেও চাইনি। আমরা সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিলাম। পুরাতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমলের যে সম্পর্ক, জমিদার-প্রজার সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক- সেই সম্পর্ক ভেঙে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে, সেটি আমাদের চাওয়া ছিল। কিন্তু বলতে হয় যে, সামাজিক বিপ্লব ছাড়া সেটি সম্ভব ছিলো না। মুক্তির যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটা ছিলো বিপ্লবের স্বপ্ন। আমি বলব যে এটি সামাজিক বিপ্লবের একটি স্বপ্ন ছিলো। সামাজিক বিপ্লবের অর্থও খুব পরিষ্কার। সেটি হচ্ছে, ব্যক্তি মালিকানার জায়গাতে সমষ্টিগত সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়নের দৃশ্যমান ছবিগুলো প্রতিফলকগুলো আমরা দেখছি, তার দ্বারা পীড়িতও হচ্ছি। কিন্তু এই উন্নয়ন হচ্ছে পুঁজিবাদের উন্নয়ন, যে উন্নয়ন বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে। এজন্যই আজ নিরপেক্ষতার কোনো জায়গা নেই এবং সামাজিক বিপ্লব ছাড়া পৃথিবীতে বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমরা সংবাদপত্র এবং মিডিয়ার স্বাধীনতার কথা বলি, আসলে যেটি দরকার সেটি হলো সাংবাদিকদের স্বাধীনতা।

এই জন্যই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত জরুরি এবং এই পুরস্কারটিও খুবই প্রয়োজন। আরেকটি কথা বলে শেষ করতে চাই, সামাজিক বিপ্লবের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি খুব জরুরি। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করা খুব দরকার যেখানে বক্তৃতা, গান-বাজনা, খেলাধুলা, তর্ক-বিতর্ক, প্রদর্শনী এবং বই পড়া হবে। পাঠাগারগুলোকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি। সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া আমরা সামাজিক বিপ্লব করতে পারব না। এই সংস্কৃতি চর্চা মোটেই আদর্শবিহীন হবে না। সংস্কৃতি চর্চা শুধু বিনোদনের এবং আনন্দলাভের জন্য নয়। সংস্কৃতি চর্চা হবে মুক্তির পথকে প্রশস্ত করার জন্য এবং মুক্তির আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার জন্য। কথাগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কিন্তু যারা মালিক তারা এই কাজগুলো করবে না, এই কাজগুলো করতে হবে আমাদের মত সাধারণ মানুষদেরকে।

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বারবার বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনেক কথা আপনি বলতে পারবেন, অনেক সংজ্ঞা দিতে পারবেন, অনেক দীর্ঘ করতে পারবেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে যদি স্থুলভাবে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিলো সামাজিক বিপ্লবের চেতনা। আমরা পুরোনো সমাজ চাইনি। আমরা কেবল পাকিস্তানকে ভেঙে ছোট একটি রাষ্ট্র তৈরি করতেও চাইনি। আমরা সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিলাম।

> আমরা সংবাদপত্র এবং মিডিয়ার স্বাধীনতার কথা বলি, আসলে যেটি দরকার সেটি হলো সাংবাদিকদের স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগারের বই প্রদান

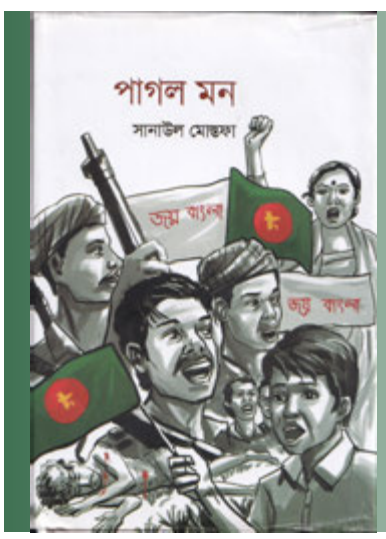

অর্থনীতিবিদ উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী এবং লেখক গবেষক ড. সানাউল মোস্তফা তার লেখা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস 'পাগল মন' বইটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগে উপহার দেন।
কৈশোরে দেখা মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হচ্ছে এই উপন্যাসে।

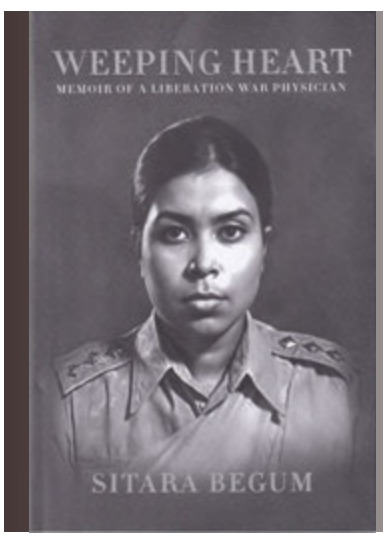

প্রকাশনা সংস্থা ইউপিএল সেতারা বেগমের লেখা 'WEEPING HEART' বইটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগে দুই কপি উপহার দেন। ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকর্মীর নানজিং মেমোরিয়াল হল অব দ্যা ভিকটিমস ইন নানজিং ম্যাসাকার বাই জাপানিজ ইনভেডারস মিউজিয়াম পরিদর্শন

চায়নার বেইজিংয়ে আয়োজিত Seminar on operational Capacity building of Bangladesh National Museum- এ অংশ নিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা শ্রী মন্টু বাবু সরকার। সেমিনারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি গত ৩ সেপ্টেম্বরে মন্টু বাবু বেইজিংয়ে অবস্থিত Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders Museum পরিদর্শন করেন এবং পরিচালক Mr. Zhou Feng-এর সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাৎকালে তারা ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং নানজিং মেমোরিয়াল হল অব দ্যা ভিকটিমস ইন নানজিং ম্যাসাকার বাই জাপানিজ ইনভেডারস-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করেন। শ্রী মন্টু বাবু একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার কথা তুলে ধরেন এবং নানজিং গণহত্যার সাথে এর মিল তুলে ধরেন। Mr. Zhou Feng -এর হাতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার তুলে দেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রকাশনা

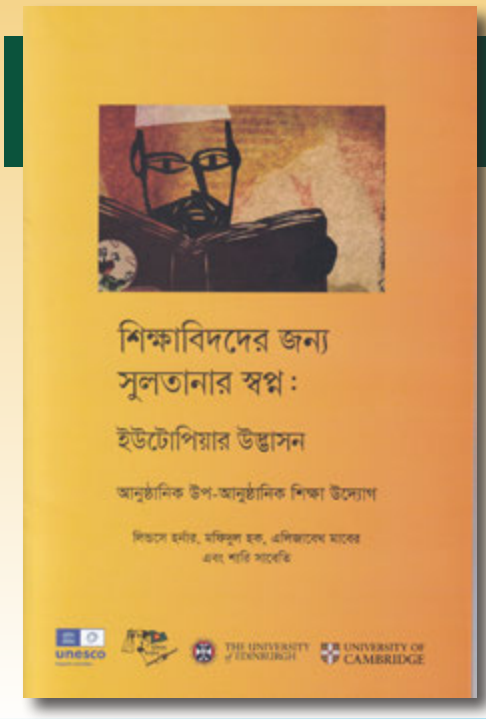

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রকাশনা 'শিক্ষাবিদদের জন্য সুলতানার স্বপ্ন : ইউটোপিয়ার উদ্ভাসন।' সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণার পর থেকে গ্রন্থটি সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ এবং ২০২৫ সালের পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হওয়ায় তার পাঠ উপস্থাপন নিয়ে নানান চিন্তাভাবনার প্রতিফলন এই প্রকাশনা। বলা যায় আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমে রোকেয়ার রচনা শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর উপস্থাপনার দর্শনগত নির্দেশনা এই নতুন প্রকাশিত গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, বর্তমান পুস্তিকাটি শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের জন্য নির্দেশিকা হিসেবে প্রণীত হয়েছে। এখানে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে রোকেয়ার রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন' শান্তি ও শিক্ষা বিষয়ে নতুন ভাবনা সঞ্চার করতে পারে। পুস্তিকাটি রচনা করেছেন লিন্ডসে হর্নার, মফিদুল হক, এলিজাবেথ মাবের এবং শারি সাবেতি। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫। পুস্তিকায় স্পেনের চিত্র পরিচালক ইসাবেল হার্গুয়েরার চলচ্চিত্র 'এল সুয়েনো দে লা সুলতানা' থেকে রঙিন ছবি ব্যবহৃত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান প্রদান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে ১ লাখ টাকার অনুদানের চেক তুলে দিচ্ছেন সুহৃদ অধ্যাপক মঞ্জুরুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ ইফতেখারুল ইসলাম জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে ১ লাখ টাকা অনুদানের চেক তুলে দেন

আগামীর আয়োজন

মাসব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের কল্পকাহিনীতে উপস্থাপিত আঙ্গিক, আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয়বস্তুর সাথে বর্তমানের সংযোগ ঘটিয়ে মাসব্যাপী (১৬ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৫) চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করতে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৫।

আবেদনের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

চতুর্থ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চতুর্থবারের মতো তরুণ গবেষকদের জন্য মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করতে যাচ্ছে। ১৭ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২৫।

আবেদন করতে ক্লিক করুন এই লিংকে
https://forms.gle/EyHYKSoHCRynXFGt9

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **মফিদুল হক**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official

শেষ পৃষ্ঠা